মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
জীবন ও নাটক

রহমত আলী

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : জীবন ও নাটক
রহমত আলী

প্রকাশকাল
প্রথম কবি প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৩০০ টাকা

Mohorshi Monoranjan Bhattachariya: Jibon O Natok by Rahmat Ali Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi First Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 (bkash) +88-01641863570
Price: 300 Taka RS: 300 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94949-4-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যশিক্ষক
মাস্টার তফাজ্জাল হোসেন-এর
মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেক সহৃদয় ও গুণী মানুষদের প্রতি ঋণস্বীকার না করলে আমার এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের অগ্রপথিক, নট, নাট্যকার, নির্দেশক, সংগঠক ও নাট্যযোদ্ধা মামুনুর রশীদকে। তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সুচিন্তিত মতামতসমৃদ্ধ মুখবন্ধ লিখে আমার বইটি অলংকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

আমার শিক্ষকদ্বয় বরেণ্য নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা শ্রদ্ধেয় কুমার রায় ও শ্রদ্ধেয় মনোজমিত্র-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যক্রমের বাইরে মহর্ষিকে নিয়ে আমার জিজ্ঞাসু মনকে বারংবার প্রশ্রয় দেয়ার জন্য।

এই বইয়ের প্রকাশক আমার অত্যন্ত স্নেহের ছোটভাই কবি প্রকাশনীর কর্নধার কবি ও লেখক সজল আহমেদকে জানাই কৃতজ্ঞতা। সজল সানন্দে বইটি প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছে এবং বইটি লেখা শেষ করার জন্য প্রতিনিয়ত তাগাদা দিয়েছে। তার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমার সহধর্মিণী ওয়াহীদা মল্লিকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সার্বক্ষণিক পাশে থেকে কখনো শ্রোতার ভূমিকায় কখনো সমালোচকের ভূমিকায় থেকে আমার লেখার গতিকে তরান্বিত করেছে।

আমার স্নেহের ছাত্র ও সহকর্মী শাহমান মৈশান যে বর্তমানে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অধ্যায়নরত, বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থটি লেখার বিষয়ে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার বিভাগের সকল শিক্ষকের অনুপ্রেরণা বইটি লেখার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছে। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে ঋণস্বীকার করতে চাই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন আমার স্নেহভাজন মনিরুজ্জামান কাজলকে। বিভিন্ন সময়ে বইটি লেখার তাগিদ দেয়ার জন্য।

কবি প্রকাশনীর মোবারক হোসেন বইটি কম্পোজ ও সংশোধন করে দিয়েছে। অফিসের (থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ) কাজের বাইরে বইয়ের বেশ কিছু অংশ কম্পোজ ও সংশোধন করে দিয়েছেন আবু ছালেহ আহম্মদ ও মনোহর চন্দ্র দাস। তাদের প্রত্যেককে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

কবি প্রকাশনীর মিষ্টি ছেলে সুমন করোনাক্রান্তিকালে বিরোধ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে আমার লেখা বিভিন্ন সময়ে বাড়ি থেকে প্রেসে নিয়ে গেছে কম্পোজ ও সংশোধন করার জন্য। তার কাছেও আমি চির ঋণী।

আমার এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি লেখায় যেসব সহায়ক গ্রন্থ উৎস সন্ধানে বিরাট ভূমিকা রেখেছে সেসব গ্রন্থের লেখকদের জানাই আমার প্রণতি।

নান্দনিক ও মননশীল ডিজাইনার সব্যশাচী হাজরা এ বইটির প্রচ্ছদ ও সামগ্রিক ডিজাইন করে দিয়েছেন। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

নক্ষত্র মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে আশপাশে যেসব নক্ষত্ররা আলো ছড়িয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, কারণ সেই আলোয় দেখে নিয়েছি আমার জ্যোতির্ময় মহর্ষিকে।

পরিশেষে আমার বন্ধুপ্রতিম বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার কলকাতার ড. আশিস গোস্বামী যিনি বন্ধুতা ও শত্রুতা উভয়তেই মহান। আমাকে তাঁর মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ভূমিকা

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের কাজে উজ্জ্বল কিন্তু নিজে থাকেন নেপথ্যে বড় ধরনের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। তাদের কথা আলোচিত হয় কম কিন্তু অবদান অপরিসীম। সে রকম একজন মানুষ মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। জন্মে ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের ঢাকা জেলার এক গন্ডগ্রামে। যদিও তার পাশের গ্রামে জন্মেছিলেন আরেক মহান মানুষ চারণ কবি ও পালাকার মুকুন্দ দাস। সেই গন্ডগ্রাম থেকে নিজ যোগ্যতায় ঢাকা শহর হয়ে কোলকাতায় প্রেসিডেন্সিতে পড়ালেখার সুযোগ পান। এর মধ্যেই তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাম্যবাদী চেতনার উন্মেষ হয়। অধ্যায়নকালেই তিনি ঢাকা কলেজ থেকে বহিস্কৃতও হন। এই চেতনা তার আমৃত্যু ছিল। মুকুন্দ দাসের দেশপ্রেমমুলক পালা তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। যখনই তিনি কোথাও প্রতিবাদ দেখেছেন তখনই সেখানে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তখনকার বড় বড় নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতার সাথে তার যোগাযোগ ঘটে। সেই সময়ে নাট্যচার্য্য শিশির ভাদুরী 'সীতা' নাটকে বাল্মিকির ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। তার অসাধারন অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে শিশির ভাদুরি তাকে মহর্ষি উপাধি দেন। ১৯৪১ সালে এক দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্যদিকে বাংলার কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। এই সময়ে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় ঘটনা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। মহর্ষি সেখানে যোগ দিয়ে বাংলার সভাপতি হন। শম্ভুমিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য এই সময়ে কোলকাতায় গড়ে তোলেন গণনাট্যের শাখা এবং বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন একেবারেই নতুন ধারার নাটক 'নবান্ন'। পেশাদার ও বাণিজ্যিক থিয়েটারের জৌলুস তখন কমে এসেছে। শিশির ভাদুরীর মতো পরিচালকও জীর্নশীর্ণ প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আর সেই সময়েই জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে মঞ্চে আর্ভিভূত হলো নবান্ন। নিরাভরন মঞ্চ সেই সাথে স্বাভাবিক অভিনয় এবং বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তু মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। নাট্যমঞ্চের এই অসাধারণ মুহুর্তে মহর্ষিকেও দেখতে পাই দূরে দাঁড়িয়ে নয়, ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করছেন। এর মধ্যে উপমহাদেশের দুর্ভাগ্য দেশ ভাগ হয়ে গেল। ভারতীয় গণনাট্যের উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুমিত্র যাঁরা বাংলার গণনাট্যকে গড়ে তুলেছিলেন তারা আর থাকতে পারলেন না। মহর্ষি পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং ১৯৪৮সালে বহুরূপী গড়ে উঠল। বহুরূপীর নামটাও দিয়েছিলেন

মহর্ষি। অভিনয়ের স্বাভাবিকতা, নান্দনিক উৎকর্ষতা এবং অভিনেত, অভিনেত্রীদের মিলিত শ্রমে গড়ে উঠল সংঘ নাট্য। আসলে যা গ্রুপ থিয়েটার। সেই সময়ে এই ভাবনার পক্ষে অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মহর্ষি। একে একে বাংলা নাটকে বিষয়বস্তুতে এবং অভিনয়ে এলো আধুনিকতা। মহর্ষি সেসব নাটকে অভিনয়ও করেছেন। সার্থক অভিনয়ের চাইতেও মহর্ষির সবচেয়ে বড় অবদান হলো বেশ কয়েকটি কালের প্রতিনিধিত্ব করে থিয়েটারকে তার বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল গণজীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া।

আজকের দিনে অনেকের কথাই উচ্চারিত হয়, আলোচিত হয় সেসব আলোচনায় মহর্ষিকে তেমনভাবে আমরা খুঁজে পাইনা। অবশ্য মহর্ষি চাইতেনও না সব সময়ই তাকে সামনেই থাকতে হবে। বহুবর্ষ পড়ে নাট্যকলার শিক্ষক-অভিনেতা রহমত আলী মহর্ষিকে নিয়ে একটি দুরূহ কাজ শুরু করেছেন। রহমত আলীর নাট্যকলায় শিক্ষা জীবন কেটেছে থিয়েটারের শহর কলকাতায়। ক্লাসের লেখাপড়ার বাইরে একাডেমি, রবীন্দ্র সদন, গিরিশ মঞ্চসহ পশ্চিম বাংলার অনেক জায়গাই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার শিক্ষক অশোক মুখোপাধ্যায় থিয়েটারের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ব্যাক্তি। তার দলে অভিনয় করে বিভিন্ন জায়গায় যেসব শ্রুত-অশ্রুত নামগুলি শুনেছেন তার মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি মহর্ষি মনোরঞ্জনের কথা তার মনে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। বইটিতে মহর্ষির জীবন, কর্ম, রাজনীতি থেকে থিয়েটার এবং থিয়েটারের রাজনীতিও তিনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। মহর্ষির জীবন নানাভাবে কর্মময়। সাম্যবাদী রাজনীতি, প্রগতি লেখক সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং সেই সাথে ভারতের স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার ফাঁকি এসবই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তার এই দীর্ঘ জীবনকে একটি বইয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু এ বইটির উদ্দেশ্য শুধু মহর্ষির জীবন বর্ণনা নয় তার পথে যাঁরা এখনও কাজ করছেন তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করা। ভবিষ্যতে থিয়েটারের পথে আরো কোন নিবেদিত প্রাণ গবেষক হয়তো মহর্ষিকে এবং মহর্ষির মতো আরো কোন মনিষীকে খুজে বের করবে। সেইটুকু কৌতুহল সৃষ্টি হলেই রহমত আলীর পরিশ্রম সার্থক হবে। প্রত্যাশা করি তার এই কাজটি বাংলা নাটকের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দেখা দেবে।

মামুনুর রশীদ
ধানমন্ডি, ঢাকা।
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

পূর্বভাষণ

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিষয়ে অধ্যায়নের সময় আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল কলকাতার তথা বাংলা থিয়েটারের সামগ্রিক নাট্যচর্চার ইতিহাস। ১৭৯৫ সালে লেবেদেফ-এর 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা থেকে কলকাতার বাবুদের থিয়েটার চর্চা 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দিয়ে ১৯৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা, পেশাদার থিয়েটার চর্চা, গণনাট্য আন্দোলন, গ্রুপথিয়েটার নাট্যচর্চা এ সবই ছিল আমাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক এবং নাট্যসংগঠকদের জীবন ও নাট্যকর্ম পড়তে হতো। যেমন, নট-নাট্যকার, সংগঠক নির্দেশক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, বিনোদিনী, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নট-নাট্যকার মহেন্দ্রগুপ্ত, গণনাট্যের নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র প্রমুখ। কিন্তু বিখ্যাত নট-নাট্যকার সংগঠক ও দার্শনিক মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আমি গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, প্রবন্ধ, পত্রিকায় পড়ে এবং আমার শিক্ষক কুমার রায় ও মনোজ মিত্রের সঙ্গে কথপোকথনে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি—তাতে আমার মনে হয়েছে এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি। তখন থেকেই আমি এই সর্বজ্ঞানী মানুষটির সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। মহর্ষিকে জানার উপলব্ধি থেকেই আমার এই গ্রন্থ রচনা এবং তাঁর মূল্যায়ন করা।

এই গ্রন্থে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাটক ও জীবনের আলোচনা তিনটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—প্রথম অধ্যায়ে তাঁর বাল্য-জীবন ও শিক্ষা-জীবন, রাজনৈতিক-জীবন ও অভিনয়-জীবন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাল্য ও কৈশোর-জীবন কেটেছিল গ্রামীণ নাট্যাভিনয় আস্বাদনের সময় থেকেই অর্থাৎ তাঁর নিজ গ্রামের স্কুলে পড়াশুনার কাল থেকেই। শিক্ষা-জীবনে ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে শুরু করেন এবং বুড়ি বালারামের তীরের আন্দোলনের সমর্থক হওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এমএসসি পড়ার সময় তিনি ভারত রক্ষা আইনে বন্দি হন এবং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে চট্টগ্রামে কুতুবদিয়া দ্বীপের কারাগারে, সেখান থেকে হুগলি জেলার বদনগঞ্জের জেলে স্থানান্তরিত হন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত কলেজে

অধ্যাপনার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন। যদিও স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দল অনুশীলনের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হওয়া এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি ঢাকার ব্যবসায়িক থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করেন। এই তথ্য দিয়েছি এই কারণে, গণনাট্য আন্দোলনের পূর্বেই রাজনৈতিক সংগঠকরূপে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা জন্মেছিল। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা' নাটক প্রযোজনায় মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকা গ্রহণ করায় পরবর্তীকালে মহর্ষি হিসেবে চিহ্নিত হন। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, রাজনৈতিক সংগঠক হলেও গণনাট্য সংঘে যোগদানের পূর্বে তাঁর পরিচিতি ঘটে গিয়েছিল, নাট্যকার এবং অভিনেতা হিসেবে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিনয়ের ওপর আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মহর্ষির বিভিন্ন নাটকে অভিনয় সম্পর্কে, তাঁর বিপ্লবী চিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত, শম্ভু মিত্র, সুধীপ্রধান, দিগিন বন্দোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্যের সমর্থনে নানা তথ্য হাজির করার চেষ্টা করেছি। খুব সংক্ষেপে হলেও তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনয় সাফল্যের জায়গাটির কথা উল্লেখ করেছি অন্যথায় অভিনেতা হিসেবে তাঁর সামগ্রিক সাফল্যের জায়গাটি অপূর্ণ থাকত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাটকগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কেন তাঁর নাটকগুলো বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকের মতো প্রযোজনা সাফল্য পায়নি তাও বিশ্লেষিত হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর নাটকে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন বিষয়ক আলোচনাও করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নাট্যসংগঠক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাট্যসংগঠক হিসেবে দুটি পর্ব আলোচিত হয়েছে। প্রথম পর্ব—গণনাট্য এবং দ্বিতীয় পর্ব—বহুরূপী। আলোচনায় দেখানো হয়েছে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যে প্রগতিশীল মনোভাব ছিল, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ নাট্যসংগঠক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গণনাট্য সংঘে যোগদান করাতে এবং গণনাট্য সংঘকে সমৃদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিল। মার্কসবাদ অধ্যায়নের ফলে মনোরঞ্জনের পক্ষে গণনাট্য সংঘকে মানবমুখী ক্রীয়াকাণ্ডে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, এটা অনেক বর্তমান গণনাট্যকর্মী আজও জানেন না বলেই আমি এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছি। সংগঠক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তাঁর লেখা 'সাহিত্যে প্রগতি' নামক প্রবন্ধে। ১৯৪৭ সালে গণনাট্য সংঘের আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি যোগ দেন এবং সভাপতি হিসেবে তিনি ভাষণ দেন তা এই অধ্যায়ের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে ১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে তাঁর লেখা ১৩টি প্রবন্ধ সংকলন একত্রিত করে 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' গ্রন্থে প্রকাশ পায়, যাতে তাঁর সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় মেলে। ১৯৪৮ সালে মহর্ষি গণনাট্য ছেড়ে এসে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যসংগঠনের

সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সে প্রসঙ্গে তাঁর জবানবন্দি বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখানো হয়েছে গণনাট্য সংঘ-ত্যাগে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোথায়? এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করেছি মহর্ষি আমৃত্যু 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি থাকলেও, গণনাট্য সংঘের সঙ্গে তিনি কখনো সম্পর্ক ত্যাগ করেননি বরং গণনাট্যের প্রেরণাস্বরূপ প্রগতিশীল সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণ ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্রের একটি চিঠির প্রতিবাদ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটাও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইতিহাস বিশ্লেষণে অনেক সহায়ক হবে বলে মনে করি।

আর একটি কথা, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু উক্তি একাধিকবার ব্যবহার করেছি। যৌক্তিক কারণেই।

সূচিপত্র

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে ১৫
নাট্যকার মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ৪৭
নাট্যসংগঠক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১০৫
উপসংহার ১২৬
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা ১২৮
পরিশিষ্ট-১
পেশাদারী মঞ্চে মহর্ষির কালানুক্রমিক অভিনয় তালিকা ১৩১
পরিশিষ্ট-২
মহর্ষি-অভিনীত চলচ্চিত্রের অসম্পূর্ণ তালিকা ১৩৪
পরিশিষ্ট-৩
গণনাট্য সংঘ ও বহুরূপী পর্বে মহর্ষির অভিনয় ১৩৭
পরিশিষ্ট-৪
মহর্ষির অভিনীত নাটক ও অন্যান্য ছবি ১৩৮

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে

'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। নামের পূর্বে 'মহর্ষি' বিশেষণটি কেন? 'মহর্ষি' মানে তো ঋষি-শ্রেষ্ঠ। আর এই ঋষি-শ্রেষ্ঠ বলতে তো রামায়ণের বাল্মীকিকে বোঝায়। তাহলে? না মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রামায়ণের বা পুরাণের বাল্মীকি নন; বাস্তবের বাল্মীকি।

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি। যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ১৯২৩ সাল। এ সময়ে ইডেন গার্ডেনে এক বিরাট একজিবিশন হয়। এই এগজিবিশনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকটি চার রাত্রি অভিনীত হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর সংযত, সাবলীল ও স্বাভাবিক অভিনয় দেখে দর্শকরা অভিভূত হন। এবং অচিরেই তাঁর অভিনয়-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'সীতা' নাটকেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের নির্দেশনায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারে প্রথম অভিনয়। 'বাল্মীকি' চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় পরবর্তীকালে তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখান থেকেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শুধু নাট্যজীবনে নয়, কর্মজীবনেও 'মহর্ষি' আখ্যায় সর্বজনবিদিত হয়েছিলেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত বলেন—"নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর নির্মল চারিত্র্যমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'মহর্ষি' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রঙ্গজগতে 'মহর্ষি' রূপেই পরিচিত ছিলেন।"[১]

এই প্রবন্ধে আমি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-এর সম্পূর্ণ নামের স্থানে মাঝে মাঝে শুধু 'মহর্ষি' নামটি ব্যবহার করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রি. ২৬ জানুয়ারি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা বিক্রমপুরের কামারখারা স্বর্ণগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংসারে। "পিতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য—তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, তপ্তকাঞ্চনাভা দেহ, মধুর ভাষণ সর্বজনবিদিত ছিল। মাতা স্বর্ণময়ী দেবী সরলা, ভক্তিপরায়না অথচ প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন।"[২] শিক্ষকতা বা গুরুগিরি ছিল তাঁদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি।

তাঁর পিতা দরিদ্র হলেও সকলে তাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি তপ্তকাঞ্চনাভা দেহ, মধুরভাষণ'[৩] লোকের শ্রদ্ধা সহজেই আকর্ষণ করত। মহর্ষি 'পিতার গৌরকান্তি এবং জননীর প্রখর বুদ্ধি'[৪] দুই-ই পেয়েছিলেন।

মহর্ষির শৈশব ও কৈশোরকাল কেটেছে তাঁর গ্রাম কামারখারাতেই। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের মানুষে দীর্ঘদিন ধরে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতেন। গ্রামে পোস্টঅফিস ছাত্র বৃত্তি স্কুল, মাইনর স্কুল (১৮৮৭-৮৮) তারপর হাইস্কুল ও (১৮৯৯) ছিল। পিতার কাছে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রামের কালীমোহন দেব পাঠশালায় তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। ১৯০৬ সালে মহর্ষি তাঁর গ্রামের রাধানাথ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তি পেলেও মহর্ষির সে বৃত্তি গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না।

তাঁর জাতীয়তাবোধ এমনই তীব্র ছিল, যে সরকারি গোলামখানায় লেখাপড়া করতেও উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু গ্রামের লোকজন তাঁকে অনেক অনুরোধ করার কারণে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে পড়াকালীন তিনি তাঁর দূরসম্পর্কের এক মামা দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সমাজসেবামূলক কাজ খুব কাছ থেকে মনোযোগসহকারে অবলোকন করেছেন এবং উৎসাহিত হয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় সেই সময়ে বিক্রমপুরের ওই সুদূর কামারখারা গ্রামে ১৮৯৬ সালে 'নেপচুন থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কিছুদিন পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্যামসুন্দর থিয়েটার পার্টি'। বাল্যকাল থেকেই এসব নাট্যদলের অভিনয় দেখে অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্ম নেয়। এ ছাড়া আশপাশের গ্রামে যেখানেই যাত্রা বা পালাগান হতো সেখানেই তিনি হাজির হতেন। শুধু তাই নয় যাত্রা শুনে এসে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে সেই যাত্রাপালার বিভিন্ন অংশ অনুকরণ করে অভিনয় করতেন। যাত্রাপালার প্রতি তাঁর এতটাই আকর্ষণ গড়ে ওঠে যে একবার তিনি যাত্রাপালায় অভিনয় করবেন বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। মহর্ষি বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা পালার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মনে রাখা দরকার মুকুন্দ দাসের জীবনের অধিকাংশ সময় যদিও কেটেছিল বরিশালে। কারণ বরিশালের স্বাধীনতা-বিপ্লবী জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাবশিষ্য ছিলেন মুকুন্দ দাস। মুকুন্দ দাসের যাত্রাদলের নাম ছিল 'স্বদেশী' যাত্রা পার্টি। কিন্তু মুকুন্দ দাসের জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বানারীতে, তাঁর পিতৃভূমি কামারখারা অর্থাৎ মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গ্রামেই। চারণকবি মুকুন্দ দাস স্বদেশি আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যাত্রাপালা রচনা করেন। এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর দল নিয়ে পালাগান করে বেড়িয়েছেন। তাঁর পিতৃভূমি কামারখারাতে এসেও বহুবার পালাগানের আসর বসিয়েছেন। এই পালাগান দেখে মহর্ষি প্রবলভাবে অভিনয়ে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই সঙ্গে স্বদেশি ভাবধারায়। বাংলা থিয়েটারে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রবাদপুরুষ একটি মহিরুহ। তিনি অভিনেতা, নাট্যকার, সংগঠক এবং রাজনীতিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী কর্মী। এত গুণসম্পন্ন মানুষ বাংলা থিয়েটারে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। তাঁর জীবন ছিল পুরোদস্তুর এক

রাজনৈতিক-জীবন। বর্তমান প্রজন্মের অনেক নাট্যকর্মী হয়তো তাঁকে জানে না বা চেনে না, কারণ তাঁকে নিয়ে খুব একটা আলোচনা বা গবেষণা হয়নি। তারপরও তাঁর কিছু লেখা এবং সে সময়ের অর্থাৎ কিছু অভিনেতা, নাট্য-দর্শকের লেখা থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারি। তবে আজও তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি।

আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, অভিনেতা ও একজন সংগঠক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব এবং সফলতার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তাই সমাজ রাজনীতি কিংবা শিল্প পৃথক নয় বরং একে অপরের দায়বদ্ধ। শিল্প যদি জীবনের জন্য হয় বা শিল্পের জন্যই যদি জীবন হয়— তাহলে আধুনিকতার বিচারে যখন শিল্পকে জীবনের কষ্টিপাথরে সবসময় আমরা পরখ করে দেখার প্রয়োজন মনে করি, মহর্ষি মনোরঞ্জনের জীবনবৃত্তান্ত কোনোভাবেই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মহর্ষি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই বিদেশি বস্ত্র বর্জন করেন। সেই থেকে সারা জীবন খদ্দরের পোশাক পরেছেন। অর্থাৎ একটি খদ্দরের কাপড় দুটুকরো করে লুঙ্গির মতো করে পরতেন। আর তার সঙ্গে মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত একদিন মহর্ষিকে প্রশ্ন করেছিলেন, "একটা আস্ত কাপড়কে দু'টুকরো করে পরেন কেন?"—উত্তরে বলেছিলেন, "আমার তো মনে হয় সকলেরই এই রকম করে কাপড় পরিধান করা উচিত। যে দেশের মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারে না, জীবনধারণের নানান সমস্যায় যে জাতি বিব্রত, তাদের পক্ষে বিলাসিতা করা শোভনও নয় সঙ্গতও নয়।"[৫] জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশবাসীর কথাই ভেবেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই অর্থাৎ কৈশোর থেকেই তিনি সাম্যবাদী চিন্তাধারা পোষণ করতেন। এ জন্য তিনি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং জেলও খেটেছিলেন। এই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও সাম্যবাদী চেতনাই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং গণনাট্য আন্দোলনে যোগদানে ত্বরান্বিত করে। মহর্ষি এতটাই ব্রিটিশবিরোধী ছিলেন যে বিদেশি কাপড় শুধু বর্জনই নয় সিদ্ধান্তও নেন যে, এন্ট্রাস পরীক্ষা দেবেন না—বিদেশি শিক্ষাও বর্জন করবেন। কিন্তু তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন বলে গ্রামের সকলের অনুরোধে ১৯০৬ সালে পরীক্ষা দেন, এবং ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

স্কুলে থাকতেই মহর্ষি অসাধারণ আবৃত্তি করতেন। খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। গান গেয়েও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমগ্র জীবনের ভিত তৈরি হয়েছিল অভিনয় কলার ওপর ভিত্তি করে। আজীবন তিনি নাট্যকলা ও নাট্যচর্চার সঙ্গে থেকে ভবিষৎ প্রজন্মের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

পেশাদারি থিয়েটারে অভিনয় দিয়ে তাঁর পেশাদারি অভিনয় শুরু। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচয়িতা ও শিশুসাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহর্ষির প্রথম অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—

> "তখন মূলচরে (কামারখারার দক্ষিণে মূলচর গ্রামে) আমাদের নাট্যসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা স্থির করলাম—'আনন্দমঠ' অভিনয় করবো। আমি নাট্যরূপ দিলাম। মনোরঞ্জন পরম আগ্রহের সঙ্গে এই অভিনয়ে যোগদান করে। আমার মনে পড়ে ১৯০৭-১৯০৮ সালে (বাংলা ১৩১৪-১৩১৫ সালের) বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে এই অভিনয় হয়। মনোরঞ্জন জীবনানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁর তখনকার দীপ্ত গৌরকান্তি, নবযৌবনের সতেজ কলদৃপ্ত কণ্ঠস্বর সকলকে বিস্মিত ও পুলকিত করেছিল। মনোরঞ্জনের এই প্রথম অভিনয়। 'আনন্দমঠ' অভিনয়ে মনোরঞ্জন বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।"[৬]

ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে অনুশীলন সমতির নেতা পুলিন বিহারী দাস-এর সংস্পর্শে আসেন। "কিছুদিনের মধ্যে তিনি 'অনুশীলন গুপ্ত মন্ত্রণাচক্রে' যোগদান করেন।"[৭] মহর্ষির তখন পোশাক ছিল হাঁটু অবধি খদ্দরের ধূতি, খালি পা খালি গা, মাথায় টিকি সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো। কলেজের অধ্যক্ষ মি. ব্রাউনিং এতে আপত্তি জানালেও তিনি আপন ইচ্ছা অনুযায়ী পোশাক পরেই কলেজে আসতেন। এই পোশাক পরা নিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত-এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ঢাকা কলেজে তিনি বেশি দিন পড়েননি। ১৯০৬ সালে বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পরে ইংরেজ সরকারের অনুমোদিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে ছাত্ররা যাতে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য স্থাপিত হয় ১৯০৭ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। মহর্ষিও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় এসে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এ যোগদান করেন। "পরিষদে তখন শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন শ্রী অরবিন্দ, অধ্যাপক বিনয় সরকার, ড. রাধামুকুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দোপাদ্যায়, হিরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। এমনকি পরিষদের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা বিষয়ক নিবন্ধ পাঠ করাতেন। ১১৯ নং বউবাজার স্ট্রীটে তখন কলকাতা ন্যাশনাল কলেজ চালু ছিল। এই পরিষদের অধীনে সপ্তমানের পরীক্ষায় (তখনকার এফএ-র সমান) প্রথম স্থান অধিকার করেন।"[৮] এরপর ১৯০৭ সালে পিতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ পিতার ইচ্ছায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বাহেরক গ্রামের শ্রী কামিনীকুমার উকিলের দ্বিতীয় কন্যা সুহাসিনী দেবীকে বিয়ে করেন। এ বছরেই পিতার মৃত্যু হয় এবং সংসারের সকল দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়ে। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এ ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে ল্যাবরেটরি সহায়ক পদে যোগদান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যাওয়ার কথা থাকলেও অনুশীলন সমিতির কাজে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ তিনি নিতে পারেননি।

১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হওয়ায় সরকারের নজর পড়ে তাঁর দিকে। তাঁর কামারখারার বাড়িও ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। সোনারং-এর বিদ্যালয়ে এবং মহর্ষির প্রতি সরকারের নজর পড়ায় অনুশীলন সমিতির কর্মকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। মহর্ষি সোনারং থেকে প্রথমে কুমিল্লায়, পরে চাঁদপুর এবং কামারখারা রাধানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। মহর্ষির অনুশীলন দলের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, শিক্ষকতার ফাঁকে অভিনয় চর্চাও চলছিল।

কামারখারায় রাধানাথ হাই ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রানী' নাটকে মহর্ষি কুমার সেন-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর প্রযোজনা ও নির্দেশনায় এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। 'রাজা ও রানী' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন—

> "আমার যতদূর জানা আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজাও রানী' অভিনয় বিক্রমপুর অঞ্চলে সেই প্রথম। কুমার সেনের রূপসজ্জায় তাকে অতি সুন্দর মানিয়েছিল এবং মনোরঞ্জনের সেই 'বল বোন এর চেয়ে মৃত্যু ভালো' অংশটি যেন এখনো আমার কানে বাজছে। কি গম্ভীর, বেদনার্ত, নির্ভীক কণ্ঠস্বর। অনেকে পরবর্তীকালে তার সেই স্বর, অভিনয়-নৈপুণ্য দেখেছেন। সে অতি সুন্দর অভিনয় করেছিল।"[৯]

১৯১২ সালে আইএসসি পড়ার জন্য কলকাতার রিপণ (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন, ১৯১৪ সালে আইএসসি পরীক্ষায় তিনি গৌরবের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৪তম স্থান লাভ করেন। ঠিক পরীক্ষার পূর্বে মহর্ষি প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হন। ড. নীলরতন সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও সিক-বেড-এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ সময় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘাযতীন) সহযোগিতায় কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। যতীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর বালেশ্বরের মর্মান্তিক ঘটনা এবং বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর মহর্ষি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে গুপ্তচরের দৃষ্টি পড়ে তাঁর গতিবিধির ওপর। তাঁর কামারখারার বাড়িতে অনুশীলনের কর্মকর্তাদের অনেকে আত্মগোপন করে সমিতির কাজ চালাচ্ছিলেন। এ সংবাদও গুপ্তচরেরা পায়। ফলে সরকার পক্ষের নির্দেশ এলো কলেজ কর্তৃপক্ষ এ মুহূর্তে তাকে যেন কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ ছিলেন মি. জেমস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ। সরাসরি তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে তার মন চায়নি। জেমস তাঁকে দুটো অনুরোধ করেছিলেন—রাজনীতির সম্পর্ক ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি দিতে, নয় স্বেচ্ছায় কলেজ ছাড়তে। তিনি নির্ভীকভাবে দ্বিতীয় অনুরোধটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল—

> "His character has been quite good, but I have been under government order compelled to ask him to withdraw."[১০]

'Quite' শব্দটির তলায় একটি লম্বা দাগ টেনে দিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক কলেজ ঘুরেও তিনি কোথাও ভর্তি হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মি. জেমস-এর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাখন লাল সেনের সুপারিশে সিটি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই মহর্ষি ১৯১৬ সালে বিএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। মহর্ষি ছাত্রাবস্থাতেই টিউশনি করে সংসার চালাতেন। তাঁর তিন পুত্র কন্যা ছিল। গ্রামের বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হতো। এত দিনে মহর্ষি, সরকারের চোখে সন্দেহযুক্ত হয়েই ছিলেন—বেশি দিন এভাবে আর কাটাতে পারলেন না। ১৯১৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর তাকে গেপ্তার করা হলো, ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধীনে। এক মাস প্রেসিডেন্সি জেলের নির্জন কক্ষে আটকে রাখার পর তাঁকে কুতুবদিয়া দ্বীপে, তারপর হুগলি জেলার কায়াপট বন্দনাগঞ্জের জেলেও অনেক দিন থাকতে হয়। "১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসেন এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালে ৬০ টাকা বেতনে কেমিস্টের পদ প্রদান করেন।"[১১] দু-এক মাস কাজ করার পর এমএসসি পড়বেন বলে স্থির করলেন এবং ফিজিকসের ক্লাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯২১ সালে শুরু হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় বৈজ্ঞানিক সি.ভি. রমনের কাছে পড়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১১ নং ওয়েলিংটন স্কয়ারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' বা ন্যাশনাল কলেজে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। মতাদর্শের কারণে তিনি সেখান থেকে চলে এসে উত্তর কলকাতায় কংগ্রেসের নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কথামতো ঢাকা কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব নিয়ে মহর্ষি অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯২২ সালে মহর্ষি ঢাকা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে আড়াই মাস কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন।

এ সময় হঠাৎ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে মহর্ষির ঢাকায় দেখা হয়। তিনি মহর্ষিকে থিয়েটারে অভিনয় করার প্রস্তাব দেন। মহর্ষি নিজের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ভেবে রাজি হন। ঢাকা শহরে তখন দুটি রঙ্গালয় ছিল। ক্রাউন থিয়েটার এবং লায়ন থিয়েটার। ক্রাউন থিয়েটারে তখন 'চন্দ্রশেখর' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মহড়া চলছিল। মহর্ষি 'চন্দ্রশেখর' নাটকে 'চন্দ্রশেখর' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন। চার রাত্রি এই দুটি নাটকের অভিনয় হয়। মহর্ষি দেড়শ টাকা দক্ষিণা পান। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার এই যে মহর্ষির প্রথম অভিনয়ে হাতেখড়ি যোগেন্দ্রনাথের কাছে আবার সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করে অর্থ উপার্জনও তাঁরই কাছে। এই নাটক দুটিতে অভিনয় করে মহর্ষি প্রচুর খ্যাতি